চিরায়ত বই

১৯

কবি

কবি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০২৩

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সব্যসাচী হাজরা

নান্দীমুখ
শেখ মোহাম্মদ সালেহ্ রাব্বী

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য: ৩০০ টাকা

Kabi a novel by Tarasankar Bandyopadhyay Published by
Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205
Kobi Prokashani First Edition: August 2023
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 300 Taka RS: 300 US$ 15
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-96871-8-4

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

“এই খেদ মোর মনে,
ভালোবেসে মিটল না আশ, কুলাল না এ জীবনে।
হায়! জীবন এত ছোট কেনে,
এ ভুবনে?”

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার লাভপুরে, ১৮৯৮ সালের ২৩ জুলাই। কলেজ ছেড়ে মহাত্মা গান্ধির ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দান। কারাবরণ করেছেন একাধিকবার। আজীবন কংগ্রেসি রাজনীতিতে আস্থাশীল, ছিলেন আইন প্রণেতাও। বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক। লিখেছেন ৬৫টি উপন্যাস, ৫৩টি ছোটগল্প-সংকলন, ১২টি নাটক, ৪টি প্রবন্ধ-সংকলন, ৪টি স্মৃতিকথা, ২টি ভ্রমণকাহিনি, ১টি কাব্যগ্রন্থ এবং ১টি প্রহসন।

আরোগ্য নিকেতন উপন্যাসের জন্য ১৯৫৫ সালে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' ও ১৯৫৬ সালে 'সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার' পান। ১৯৬৭ সালে *গণদেবতা* উপন্যাসের জন্য 'জ্ঞানপীঠ পুরস্কার'। ১৯৬২ সালে 'পদ্মশ্রী', ১৯৬৮ সালে 'পদ্মভূষণ' সম্মানেও বিভূষিত হন তিনি। সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'শরৎস্মৃতি পুরস্কার' (১৯৪৭) ও 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' (১৯৫৬)-এ সম্মানিত। তাঁর চল্লিশটি রচনা চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। যাদের অন্যতম *সপ্তপদী*, *দুই পুরুষ*, *গণদেবতা*, *আরোগ্য নিকেতন*, *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*, *অভিযান* ও *জলসাঘর*।

রাঢ়ের মানুষের জীবনচিত্র, ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম, মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, সামন্ততন্ত্র-ধনতন্ত্রের দ্বন্দ্বে পুঁজির বিজয়– সর্বোপরি নবভারত ছিল তারাশঙ্করের সাহিত্য সাধনার মূল বিষয়বস্তু।

দাম্পত্যসঙ্গী : উমাশশী দেবী। মৃত্যু : ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ সালে।

এক

শুধু দস্তুরমতো একটা বিস্ময়কর ঘটনাই নয়, রীতিমতো এক সংঘটন। চোর ডাকাত বংশের ছেলে হঠাৎ কবি হইয়া গেল।

নজির অবশ্য আছে বটে—দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। কিন্তু সেটা ভগবৎ-লীলার অঙ্গ। মূককে যিনি বাচালে পরিণত করেন, পঙ্গু যাঁহার ইচ্ছায় গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে, সেই পরমানন্দ মাধবের ইচ্ছায় দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের জন্ম সম্ভবপর হইয়াছিল; রামায়ণের কবি বাল্মীকি ডাকাত ছিলেন বটে, তবে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণের ছেলে। সেও ভগবৎ-লীলা। কিন্তু কুখ্যাত অপরাধপ্রবণ ডোমবংশজাত সন্তানের অকস্মাৎ কবিরূপে আত্মপ্রকাশকে ভগবৎ-লীলা বলা যায় কি না সে বিষয়ে কোনো শাস্ত্রীয় নজির নাই। বলিতে গেলে গা ছমছম করে। সুতরাং এটাকে লোকে একটা বিস্ময় বলিয়াই মানিয়া লইল। এবং বিস্মিতও হইল।

গ্রামের ভদ্রজনেরা সত্যই বলিল—এ একটা বিস্ময়! রীতিমতো!

অশিক্ষিত হরিজনরা বলিল—নেতাইচরণ তাক লাগিয়ে দিলে রে বাবা!

যে বংশে নিতাইচরণের জন্ম, সে বংশটি হিন্দু সমাজের প্রায় পতিততম স্তরের অন্তর্গত ডোমবংশ, তবে শহর অঞ্চলে ডোম বলিতে যে স্তরকে বুঝায় ইহারা সে স্তরের নয়। এ ডোমেরা বাংলার বিখ্যাত লাঠিয়াল—প্রাচীনকাল হইতেই বাহুবলের জন্য ইহারা ইতিহাসবিখ্যাত। ইহাদের উপাধি হইল বীরবংশী। নবাবি পলটনে নাকি একদা বীরবংশীরা বীরত্বে বিখ্যাত ছিল। কোম্পানির আমলে নবাবি আশ্রয়চ্যুত হইয়া দুর্ধর্ষ যুদ্ধব্যবসায়ীর দল পরিণত হয় ডাকাতে। পুলিশের ইতিহাস ডোমবংশের কীর্তিকলাপে পরিপূর্ণ। এই গ্রামের ডোম পরিবারগুলির প্রত্যেকের রক্তে রক্তে এখনও সেই ধারা প্রবাহিত। পুলিশ কঠিন বাঁধ দিয়াছে সে প্রবাহের মুখে—লোহা দিয়া বাঁধিয়াছে। হাতকড়ি, লোহার গরাদে দেওয়া ফটক, ডান্ডাবেড়ির লোহা প্রত্যক্ষ; এ ছাড়া ফৌজদারি দণ্ডবিধির আইনও লোহার আইন। কিন্তু তবু বাছিয়া বাছিয়া ছিদ্রপথে অথবা অন্তরদেশে ফল্গুধারার মতো নিঃশব্দে অধীর গতিতে আজও সে ধারা বহিয়া চলিয়াছে। নিতাইয়ের মামা গৌর বীরবংশী—অথবা গৌর ডোম এ অঞ্চলে বিখ্যাত ডাকাত। এই বৎসরখানেক পূর্বেই সে পাঁচ বৎসর 'কালাপানি' অর্থাৎ আন্দামানে থাকিয়া দণ্ড ভোগ করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিয়াছে।

নিতাইয়ের মাতামহ—গৌরের বাপ শম্ভু বীরবংশী আন্দামানেই দেহ রাখিয়াছে। নিতাইয়ের বাপ ছিল সিঁদেল চোর। পিতামহ ছিল ঠ্যাঙাড়ে।

নিজের জামাইকেই নাকি সে রাতের অন্ধকারে পথিক হিসাবে হত্যা করিয়াছিল। জামাইবাড়ির মাঠ এখান হইতে ক্রোশখানেক দূরে।

ইহাদের ঊর্ধ্বতন পুরুষের ইতিহাস পুলিশ-রিপোর্টে আছে, সে এক ভীতিপ্রদ রক্তাক্ত ইতিহাস।

এই নিতাইচরণ সে বংশের ছেলে। খুনির দৌহিত্র, ডাকাতের ভাগিনেয়, ঠ্যাঙাড়ের পৌত্র, সিঁদেল চোরের পুত্র—নিতাইয়ের চেহারায় বংশের ছাপ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। দেহ কঠিন, পেশি দীর্ঘ সবল, রং কালো, রাত্রির অন্ধকারের মতো। শুধু বড় বড় চোখের দৃষ্টি তাহার বড় বিনীত এবং সে দৃষ্টির মধ্যে একটি সকরুণ বিনয় আছে। সেই নিতাই অকস্মাৎ কবিরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। লোকে সবিস্ময়ে তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল—নিতাই গৌরবের লজ্জায় অবনত হইয়া জোড়হাতে সকরুণ দৃষ্টিতে মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার সঙ্গে ঠোঁটের রেখায় ঈষৎ একটু লজ্জিত হাসি।

ঘটনাটা এই—

এই গ্রামের প্রাচীন নাম অট্টহাস—একান্ন মহাপীঠের অন্যতম মহাপীঠ। মহাপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম মহাদেবী চামুণ্ডা। মাঘী পূর্ণিমায় চামুণ্ডার পূজা বিশিষ্ট একটি পর্ব; এই পর্ব উপলক্ষে এখানে মেলা বসিয়া থাকে। এই মেলায় চিরকাল জমজমাট কবিগানের পালা হয়। নোটনদাস ও মহাদেব পাল—দুইজনে এ অঞ্চলে খ্যাতনামা কবিয়াল, ইহাদের গান এখানে বাঁধা। এবার সেই প্রত্যাশায় অপরাহ্নে বেলা হইতেই লোকজন জমিতে শুরু করিয়া সন্ধ্যা নাগাদ বেশ একটি জনতায় পরিণত হইয়াছিল—প্রায় হাজার দেড় হাজার লোকের একটি সমাবেশ।

সমারোহ করিয়া আসর পাতা হইয়াছিল, সন্ধ্যায় চারিদিকে চারিটা পেট্রোম্যাক্স আলো জ্বালা হইল, কবিয়ালদের মধ্যে মহাদেবের দল আসিয়া আসরে বসিল, কিন্তু নোটনদাসের সন্ধান মিলিল না। যে লোকটি নোটনকে ডাকিতে গিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—বাসাতে কেউ কোথাও নাই মশায়—লোক না—জন না—জিনিস না, পত্তর না—সব ভোঁ ভোঁ করছে। কেবল শতরঞ্জিটা পড়ে রয়েছে—যেটা আমরা দিয়েছিলাম।

শুনিয়া মেলার কর্তৃপক্ষ স্তম্ভিত এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল। লোকেরা হইহই করিয়া গোলমাল করিয়া উঠিল।

* * *

কাজটা যে ঘোরতর অন্যায় হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তবু বলিতে হইবে যে নোটনদাসের দোষ নাই। গতবার হইতেই তাহার টাকা পাওনা ছিল। গতবার মেলা-তহবিলে টাকার অনটন পড়িয়াছিল, সেই জন্য চামুণ্ডার মোহন্ত তাহাদের মাথায় বিল্বপত্র দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—আসছে বার। বাবা সকল, আসছে বার। আসছে বার গাওনার আগেই তোমাদের দু'বছরের টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে।

নোটন এবং মহাদেব বহুদিন হইতেই এ মেলায় গাওনা করে, এককালে এ মেলার সমৃদ্ধির সময় তাহারা পাইয়াছেও যথেষ্ট, সেই কৃতজ্ঞতা বা চক্ষুলজ্জাতেই গতবার তাহারা কিছু বলিতে পারে নাই। কিন্তু এবার আসিয়া নোটন যখন মোহন্তকে প্রণাম করিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল, তখনও তিনি টাকার পরিবর্তে তাহার হাতে দিলেন তাজা টকটকে একটি জবা ফুল, এবং আশীর্বাদ করিলেন—বেঁচে থাক বাবা, মঙ্গল হোক।

বলিয়াই তিনি প্রসঙ্গান্তরে মনোনিবেশ করিলেন। লোকজন অনেকেই সেখানে বসিয়া ছিল—অধিকাংশই গ্রামের ভদ্রলোক, তাঁহাদের সঙ্গেই প্রসঙ্গটা আগে হইতে চলিতেছিল। নোটন প্রসঙ্গটা শেষ হইবার অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। মজলিসে আলোচনা হইতেছিল—মেলার এবং মা চামুণ্ডার স্থানের আয়ব্যয় লইয়া। মোহন্ত আয় এবং ব্যয়ের হিসাব সবিস্তারে বিবৃত করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া দিলেন যে, মা চামুণ্ডার হ্যান্ডনোট না কাটিলে আর উপায় নাই। পরিশেষে মৃদু হাসিয়া বলিলেন—দাও না, তোমরা কেউ টাকা ধার দাও না বাবা! দেখ এমন খাতক আর মিলবে না। এ খাতকের কুবের খাজাঞ্চি। ধর্মের কাগজে কামনার কালিতে হ্যান্ডনোট লিখে নিয়ে অর্থ দিলে—ওপারে মোক্ষসুদ সমেত পরমার্থ কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে পাবে। বলিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই হাসিল। নোটনদাসও হাসিল। তবে সে বুদ্ধিমান। সুতরাং তারপরেই মজলিস হইতে সরিয়া পড়িল।

নোটনের বাসায় তখন নূতন একটা বায়না আসিয়া তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। এখান হইতে দশ ক্রোশ দূরে একটা মেলা বসিতেছে, সেখানে এবার প্রচুর সমারোহ, তাহারা কবিগানের আসরে নোটনদাসকে পাইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছে। অন্তত এখানকার মেলায় গাওনা শেষ করিয়াও যাইতে হইবে। আর যদি এখানে কোনোরকমে শেষের দিনের গাওনাটা না গাহিয়া আগেই যাইতে পারে তাহা হইলে তো কথাই নাই। সেক্ষেত্রে দক্ষিণার কাঞ্চনমূল্যও ওজনে ভারী হইবে।

নোটন হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বলিল—জয় মা চামুণ্ডা। তারপর সে তাহার দোহারকে বলিল—বোতলটা দে তো। বোতল না হইলে নোটনের চলে না। বোতলের মুখেই খানিকটা পানীয় পান করিয়া নোটন গা-ঝাড়া দিয়া বসিল।

লোকটি নোটনের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল, সে বলিল—তা হলে ওস্তাদ, আমাকে একটা কথা বলে দেন। আমাকে আবার এই ট্রেনেই ফিরতে হবে। ট্রেনের তো আর দেরি নাই।

নোটন হাসিয়া বলিল—আমি যদি কাল থেকেই গাওনা করি?

লোকটা বিস্মিত ও চিন্তিত হইয়া বলিল—আজ্ঞে, তা হলে এখানকার কী হবে?

নোটন বলিল—নিজে শুতে পাচ্ছিস সেই ভালো, শঙ্করার ভাবনা ভাবতে হবে না। তোকে। আমি তা হলে টাকা কিন্তু বেশি নোব।

লোকটা সোৎসাহে বলিল—আচ্ছা বেশ। তা কবে যাবেন আপনি?

—আজই। এখুনি। তোর সঙ্গে। এই ট্রেনে।

লোকটা উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

—দক্ষিণে কিন্তু পনেরো টাকা রাত্রি।

—আজ্ঞে, তাই দোব। লোকটার উৎসাহের আর সীমা ছিল না।

—কিন্তু আগাম দিতে হবে।

তৎক্ষণাৎ লোকটি একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিল। বলিল—এই বায়না। আর সেখানকার মাটিতে পা দিলেই বাকি টাকা কড়াক্রান্তি হিসেব করে মিটিয়ে দোব।

নোটখানা ট্যাঁকে গুঁজিয়া নোটন উঠিয়া পড়িল। ঢুলি ও দোহারদের বলিল—ওঠো! লোকটাকে বলিল—টাকা মিটিয়ে নিয়ে বাসায় ঢুকব কিন্তু। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে অন্ধকারে মাঠে মাঠে স্টেশনে আসিয়া মুখ ঢাকিয়া ট্রেনে উঠিয়া বসিয়াছে। এবং সে ট্রেনও চলিয়া গিয়াছে। ঘটনার এই শেষ।

* * *

নোটন ভাগিয়াছে শুনিয়া অপর পাল্লাদার কবি মহাদেব আসরে বসিয়া মনে মনে আফসোস করিতেছিল। আজও পর্যন্ত নোটনের সহিত পাল্লায় কখনো সে পরাজয় স্বীকার করে নাই, কিন্তু আজ সে সর্বান্তঃকরণে নীরবে পরাজয় স্বীকার করিল—সঙ্গে সঙ্গে নোটনকে বেইমান বলিয়া গালও দিল। তাহাকে বলিলে কি সেও যাইত না!

আসরের জনতা ক্রমশ ধৈর্য হারাইয়া ফেলিতেছিল, সংবাদটা তখনও তাহাদের কাছে পরিষ্কার হয় নাই। অধীর শ্রোতার দল কলরবে একেবারে হাট বাধাইয়া তুলিয়াছে। অন্যদিকে একপাশে মেলার কর্তৃপক্ষ এবং গ্রাম্য জমিদারগণ নোটন-প্রসঙ্গ আলোচনা করিতেছিলেন। মোহন্ত চিন্তিতভাবে দাড়িতে হাত বুলাইতেছেন। মধ্যে বলিতেছেন—তারা, তারা!

নোটন ভাগিয়াছে, কবিগান হইবে না—এই কথাটি একবার উচ্চারিত হইলে হয়, সঙ্গে সঙ্গে এই দর্শকদল বাঁধভাঙা জলাশয়ের জলের মতো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে। জলশূন্য পুষ্করিণীর ভিজা পাঁকের মতো জনশূন্য মেলাটায় থাকিবে শুধু পায়ের দাগ আর ধুলা।

ওদিকে আর একদল গ্রাম্য জমিদার একেবারে খড়ের আগুনের মতো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এখনই পাইক লাঠিয়াল ভেজিয়া গলায় গামছা বাঁধিয়া নোটনকে ধরিয়া আনিয়া জুতা মারিয়া পিঠের চামড়া তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা হইতে ক্ষতিপূরণের মামলা করিয়া হতভাগ্যের ভিটামাটি উচ্ছন্ন দিবার ব্যবস্থা পর্যন্ত—নানা উত্তেজিত কল্পনায় তৃণদাহী বহ্নির মতোই তাহারা লেলিহান হইয়া জ্বলিতেছে। এই জমিদারদের অন্যতম, গঞ্জিকাসেবী ভূতনাথ—নামে ভূতনাথ হইলেও দক্ষযজ্ঞনাশী বিরূপাক্ষের মতোই সে দুর্মদ ও দুর্দান্ত—সে হঠাৎ মালকোঁচা সাঁটিয়া লাফাইয়া উঠিল। বলিল—দুটো লোক। বলিয়া দুইটা আঙুল তুলিয়া ধরিল। কিছুক্ষণ থামিয়া থাকিয়া বলিল—দোঠো আদমি হামারা সাথ দেও, হাম আভি যায়গা। দশ কোশ

রাস্তা। আরে দশ কোশ তো দুলকিমে চলা যায়গা। বলিয়া সে যেন দুলকি চালে চলিবার জন্য দুলিতে আরম্ভ করিল।

ঠিক এই সময়েই কে একজন কথাটা জানিয়া ফেলিয়া আসরের প্রান্ত হইতে হাঁকিয়া উঠিল—উঠে আয় রে রাখহরি, উঠে আয়।

—কেন রে? উঠে গেলে আর জায়গা থাকবে না।

—জায়গা নিয়ে ধুয়ে খাবি? উঠে আয়—বাড়ি যাই—ভাত খাই গিয়ে। ওরে নোটনদাস ভাগলবা, পালিয়েছে। কবি হবে না।

—না। মিছে কথা।

—মাইরি বলছি। সত্যি।

রাখহরি রসিক ব্যক্তি, সে সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল—বলো হরি—! সমগ্র জনতা নিম্নাভিমুখী আলোড়িত জরলাশির কল্লোলের মতোই কৌতুকে উচ্ছ্বসিত হইয়া ধ্বনি দিয়া উঠিল—হরি বো—ল। অর্থাৎ মেলাটির শবযাত্রা ঘোষণা করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে তৃণদাহী বহ্নি যেন ঘরে লাগিয়া গেল। জমিদারবর্গ জনতার উপরেই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।

—কে? কে? কে রে ব্যাটা?

—ধর তো ব্যাটাকে, ধর তো! হারামজাদা বজ্জাত, ধর তো ব্যাটাকে!

ভূতনাথ ব্যাঘ্রবিক্রমে ঘুরিয়া রাখহরির বদলে যে লোকটিকে সম্মুখে পাইল, তাহারই চুলের মুঠায় দরিয়া হুংকার দিয়া উঠিল—চোপ রও শালা!

অন্য কয়েকজনে তাহাকে ক্ষান্ত করিল—হাঁ-হাঁ-হাঁ! করো কী ভূতনাথ, ছাড়ো, ছাড়ো। ও রাখহরি নয়।

ভূতনাথ তাহাকে ছাড়িয়া দিল, কিন্তু বীরবিক্রমে শাসন করিয়া দিল—খবর-দা-র!

একজন বিবেচক ব্যক্তি বলল—মেলা—খেলায় ও-রকম করে মানুষ। রং তামাশা নিয়েই তো মেলা হে। ভোলা ময়রা কবিয়াল—জাড়া গাঁয়ে কবি গাইতে গিয়ে জমিদারের মুখের সামনেই বলেছিল—“কী করে তুই বললি জগা, জাড়া গোলক বৃন্দাবন, যেখানে বামুন রাজা চাষি প্রজা—চারদিকেতে বাঁশের বন! কোথায় বা তোর শ্যামকুণ্ডু কোথায় বা তোর রাধাকুণ্ডু—সামনে আছে মুলোকুণ্ডু করগে মুলো দরশন।” তাতে তো বাবুরা রাগ করে নাই খুশিই হয়েছিল।

ভূতনাথ এত বোঝে না, সে বক্তাকে এক কথায় নাকচ করিয়া দিল—যা যা যাঃ! কীসে আর কীসে—ধানে আর তুষে।

—আরে, তুষ হলেও তো ধানের খোসা বটে। চটলে চলবে কেন? দু-তিন মাইল থেকে সব তামাক টিকে নিয়ে এসছে কবিগান শুনতে। এখন শুনছে—‘কবিয়াল ভাগলবা’; তা ঠাট্টা করে একটু হরিধ্বনি দেবে না? রেগো না।

মোহন্ত এখন মোহান্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু এককালে তিনি একজন পাকা পাটোয়ার অর্থাৎ জমিদার—সেরেস্তার কুটবুদ্ধি নায়েব ছিলেন। গাঁজা তিনি চিরকালই খান। তিনি এতক্ষণ ধরিয়া নীরবে কবিগানের কথাই চিন্তা

করিতেছিলেন। তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন আচ্ছা, আচ্ছা, তাঁর কবিগানই হবে। চিন্তা কী তার জন্যে? চিন্তামণি যে পাগলি বেটির দরবারে বাঁধা তাঁর চিনির ভাবনা! বলিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন হইয়াছে, চিনির সন্ধান মিলিয়াছে।

কবিগান চিনি কি না—সে প্রশ্ন তখন কাহারও মনে উঠিবার কথাও নয় সময়ও নয়। সুতরাং সে প্রশ্ন না করিয়া সকলে উৎসুক দৃষ্টিতে মোহন্তের মুখের দিকে চাহিল।

মোহন্ত বলিলেন—ডাক মহাদেবকে আর তার প্রধান দোয়ারকে। অতঃপর ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন—তাই হোক—গুরু-শিষ্যেই যুদ্ধ হোক। রাম-রাবণের যুদ্ধের চেয়ে দ্রোণ-অর্জুনের যুদ্ধ কম নয়। রামায়ণ সপ্তকাণ্ড, মহাভারত হলো অষ্টাদশ পর্ব।

শোরগোল উঠিল—মহাদেব! মহাদেব! ওহে করিবয়াল! ওস্তাদজি হে, শোনো শোনো।

দুই

দায়ে পড়িয়া মহাদেব প্রস্তাবটায় সম্মতি না দিয়া পারিল না।

মোহন্ত সুদুর্লভ আশীর্বাদ করিয়া তাহাকে কল্পতরুর তলায় বসাইয়া দিলেন এবং চারিদিকে প্রমত্ত জনতা। অতঃপর সম্মত না হইয়া উপায় কী! কিন্তু আর একজন ঢুলি ও দোয়ারের প্রয়োজন। ঠিক এই সময়েই নিতাইচরণের আবির্ভাব। সে জোড়হাতে পরম বিনয়সহকারে শুদ্ধ ভাষায় নিবেদন করিল—প্রভু, অধীনের একটি নিবেদন আছে—আপনাদের সি-চরণে।

অন্য কেহ কিছু বলিবার পূর্বেই মহাদেব কবিয়ালই বলিয়া উঠিল—এই যে, এই যে আমাদের নেতাইচরণ রয়েছে; তবে আর ভাবনা কী? নেতাই বেশ পারবে দোয়ারকি করতে। কিরে, পারবি না।

নিতাইয়ের গুণাগুণ কবিয়ালরা জানিত, কবিগান যেখানেই হউক, সে গিয়া ওই দোয়ারদের দলে মিশিয়া বসিয়া পড়িত। কখনো কাঁসি বাজাইত—আর দোয়ারের কাজে তো প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বেগার দিয়া যাইত।

বাবুদলের মধ্যে একজন কলিকাতায় চাকরি করেন, ময়লা কাপড়-জামার গাদার মধ্যে তিনি ধোপদুরস্ত পাট করা বস্ত্রের মতোই শোভমান ছিলেন। চালটিও তাঁহার বেশ ভারিক্কী, তিনি খুব উঁচুদরের পায়াভারী পৃষ্ঠপোষকের মতো করুণামিশ্রিত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন—বলো কী, অ্যাঁ? নেতাইচরণের আমাদের এত গুণ! A poet! বাহবা, বাহবা রে নিতাই। তা লেগে যা রে ব্যাটা, লেগে যা। আর দেরি নয়—আরম্ভ করে দাও

তা হলে। তিনি হাতঘড়িটা দেখিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—এখনই তো তোমার—! কটা বাজল?

কে একজন ফস করিয়া দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বালিয়া আগাইয়া ধরিল।

ভদ্রলোক বিরক্ত হইয়া হাতটা সরাইয়া লইয়া বলিলেন—আ! দরকার নেই আলোর। রেডিয়ম দেওয়া আছে, অন্ধকারে দেখা যাবে।

ভূতনাথ এত সব রেডিয়ম-ফেডিয়মের ধার ধারে না, সে হি-হি করিয়া হাসিয়া নিতাইকেই বলিল—লে রে ব্যাটা, লে; তাই কাক কেটেই আজ অমাবস্যে হোক। কাক—কাকই সই! তোর গানই শুনি!

নিতাই মনে মনে আহত হইলেও মুখে কিছু বলিল না। ওদিকে তখন আসরে ঢোলে কাঠি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, কুড়ুতাক কুড়ুতাক কুড়ুম-কুড়ুম।

নিতাই দোয়ারকি করিতে লাগিয়া গেল।

আপন দোয়ারের সহিত কবিওয়ালার কবিগানের পাল্লা। সুতরাং পাল্লা বা প্রতিযোগিতাটা হইতেছিল আপসমূলক—অত্যন্ত ঠাণ্ডা রকমের। তীব্রতা অথবা উষ্ণতা মোটেই সঞ্চারিত হইতেছিল না। শ্রোতাদের মধ্যে গুঞ্জন উঠিল দুই ধরনের। যাহারা উহাদের মধ্যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তাহারা বলিল—দূর দূর! ভিজে ভাতের মতো গান। এই শোনে! সাঁট করে পাল্লা হচ্ছে! চল বাড়ি যাই। দুই-চারজন আবার উঠিয়াও গেল।

অপর দল বলিল—মহাদেবের দোয়ারও বেশ ভালো কবিয়াল মাইরি! বেশ কবিয়াল, ভালো কবিয়াল। টকাটক জবাব দিচ্ছে।

নিতাইচরণের প্রশংসাও হইতেছিল। প্রশংসা পাইবার মতো নিতাইচরণের মূলধন আছে। তাহার গলাখানি বড় ভালো। তাহার উপর ফোড়নও দিতেছে চমৎকার। মহাদেবের দোয়ারকে পিছনে ফেলিয়া নিজে স্বাধীনভাবে দু-চার কলি গাহিবার জন্য সে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে।

বাবুরা ইহাতে তাহাকে উৎসাহ দিলেন—বলিহারি ব্যাটা, বলিহারি! বলিহারি!

নিতাইয়ের স্বজন ও বন্ধুজনে বলিল—আচ্ছা, আচ্ছা!

এক কোণে মেয়েদের জটলা। এ মেয়েরা সবই ব্রাত্য সমাজের। তাহাদেরও বিস্ময়ের সীমা নাই, নিতাইয়ের পরম বন্ধু স্টেশনের পয়েন্টসম্যান রাজালাল বায়েনের বউ হাসিয়া প্রায় গড়াইয়া পড়িতেছে—ও মা গো। নেতাইয়ের প্যাটে প্যাটে এত! ও মা গো!

তাহার পাশেই বসিয়া রাজার বউয়ের বোন, ষোলো-সতেরো বছরের মেয়েটি, পাশের গ্রামের বউ—সে বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছে, সে মধ্যে মধ্যে বিরক্ত হইয়া বলিতেছে—না ভাই, খালি হাসচিস তু। শোন কেনে।

রাজা বন্ধু-গৌরবে অদূরে বসিয়া ক্রমাগত দুলিতেছিল, সে হাসিয়া বলিল—দেখতা হ্যায় ঠাকুরঝি? ওস্তাদ কেয়সা গান করতা হ্যায়, দেখতা?

রাজা এই শ্যালিকাটিকে বলে—ঠাকুরঝি! নিতাইও তাহাকে

বলে—ঠাকুরঝি। শ্বশুরবাড়ি অর্থাৎ পাশের গ্রাম হইতে সে নিত্য দুধ বেচিতে আসে। নিতাই নিজেও তাহার কাছে এক পোয়া করিয়া দুধের 'রোজ' লইয়া থাকে। এই কারণেই মেয়েটির বিস্ময় এত বেশি। যে লোককে মানুষ চেনে, তাহার মধ্য হইতে অকস্মাৎ এক অপরিচিতজনকে আত্মপ্রকাশ করিতে দেখিলে বিস্ময়ে মানুষ এমনই হতবাক হইয়া যায়।

নিতাইয়ের কিন্তু তখন এদিকে চাহিয়া দেখিবার অবসর ছিল না। সে তখন প্রচণ্ড উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে, উৎসাহের প্রাবল্যে সে গল্পের উটের মতো নাসিকা-প্রবেশের পথে মাথা গলাইয়া দিল। এবং নিজেই সে স্বাধীনভাবে গান আরম্ভ করিল। আ—করিয়া রাগিণী টানিয়া মহাদেবের দোয়ারের রচিত ধুয়াটাকে পর্যন্ত পালটাইয়া দিয়া সেই সুরে ছন্দে নিজেই নূতন ধুয়া ধরিয়া দিল। এবং নিজের সুন্দর কণ্ঠের প্রসাদে তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করিয়াও ফেলিল।

মহাদেবের দোয়ার সে-ই প্রকৃত একপক্ষের পাল্লাদার ওস্তাদ। সে আপত্তি তুলিয়া বলিয়া উঠিল—অ্যাই! ও কী? ও কী গাইছ তুমি। অ্যাই—নেতাই! অ্যাই!

নিতাই সে কথা গ্রাহ্যই করিল না। বাঁ হাতখানিতে কান ঢাকিয়া ডান হাতখানি থুতু নিবারণের জন্য মুখের সম্মুখে ধরিয়া গান গাহিয়াই চলিল। সম্মুখের দিকে অল্প একটু ঝুঁকিয়া তালে তালে মৃদু নাচিতে নাচিতে সে তখন গাহিতেছিল—

হুজুর— ভদ্দ পঞ্চজন রয়েছেন যখন
সুবিচার হবে নিশ্চয় তখন—
জানি জানি—

বাবুরা খুব বাহবা দিলেন—বহুত আচ্ছা! বাহবা! বাহবা! নেতাই বলছে ভালো!

সাধারণ শ্রোতারাও বলিল—ভালো। ভালো। ভালো হে।

নিতাই ধাঁ করিয়া লাফ মারিয়া ঘুরিয়া ঢুলিটাকে ধমক দিয়া বলিল—অ্যা-ই কাটছে। সঙ্গে সঙ্গে সে তাল দেখাইয়া হাতে তালি দিয়া বাজনার বোল বলিতে আরম্ভ করিল—ধিকড় তা-তা-ধেনতা—তা-তা-ধেনতা—গুড়-তা-তা-থিয়া—ধিকড়;—হাঁ—! বলিয়া সে তাহার নূতন স্বরচিত ধুয়াটায় ফিরিয়া আসিল—

ক-য়ে কালী কপালিনী—খ-য়ে খপ্পরধারিণী
গ-য়ে গোমাতা সুরভি—গণেশজননী—
কণ্ঠে দাও মা বাণী।

একপাশে কতকগুলি অর্ধশিক্ষিত ছোকরা বসিয়া ছিল—তাহারা হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। একজন বলিল—গ-য়ে গরু, ছ-য়ে ছাগল, ভ-য়ে ভেড়া। বহুত আচ্ছা!

হাস্যধ্বনির রোল উঠিয়া গেল।

নিতাই সঙ্গে সঙ্গে খাড়া দাঁড়াইল, তারপর হাস্যধ্বনি অল্প শান্ত হইতেই বলিল—বলি দোয়ারগণ!

মহাদেবের দোয়ার রাগ করিয়া বসিয়া ছিল, অপর কোনো দোয়ারও ছিল না। কেহই সাড়া দিল না। নিতাইও উত্তরের প্রত্যাশা না করিয়াই বলিল—দোয়ারগণ! গোমাতা শুনে সবাই হাসছে। বলছে, গ-য়ে গরু, ছ-য়ে ছাগল ভ-য়ে ভেড়া!

ঢুলিটা এবার বলিল—হ্যাঁ।

—আচ্ছা।—বলিয়া সে ছড়ার সুরে আরম্ভ করিল—

গো-মাতা শুনিয়া সবে হাস্য করে।
দীন নিতাইচরণ বলছে জোড়করে—

বলিয়া হাত দুইটি জোড় করিয়া একবার চারিদিক ঘুরিয়া লইল। বন্ধু রাজা পরম উৎসাহে বলিয়া উঠিল—বহুত আচ্ছা ওস্তাদ।

কিন্তু নিতাই তখন চোখে স্পষ্ট করিয়া কিছু দেখিতেছিল না, রাজাকেও সে লক্ষ করিল না, সে আপন মনে ছড়াতেই বলিয়া গেল।

শুনুন মহাশয় দীনের নিবেদন।
গো কিম্বা গরু তুচ্ছ নয় কখন ॥
গাভি ভগবতী, ষাঁড় শিবের বাহন।
সুরভির শাপে মজে কত রাজন ॥

রব উঠিল—ভালো! ভালো! ঢুলিটা ঢোলে কাঠি দিল—ডুডুম!

নিতাই বলিল—

শাস্ত্রের সার কথা আরও বলে যাই।
গো-ধন তুল্য ধন ভূ-ভারতে নাই ॥
তেঁই গোলকপতি—বিষ্ণু বনমালি।
ব্রজধামে করলেন গরুর রাখালি ॥

নিতাইয়ের এই উপস্থিত জবাবে সকলে অবাক হইয়া গেল। ছন্দে বাঁধিয়া এমন ত্বরিত এবং যুক্তিসম্পন্ন জবাব দেওয়া তো সহজ কথা নয়। বন্ধু রাজা পর্যন্ত হতবাক; রাজার বউয়ের হাসি থামিয়া গিয়াছে, ঠাকুরঝির অবগুণ্ঠন খসিয়া পড়িয়াছে—দেহের বেশবাসও অসম্বৃত।

নিতাইয়ের তখনও শেষ হয় নাই, সে বলিল—

তা ছাড়া মশাই—আছে আরও মানে—
গো মানে পৃথিবী শুধান পণ্ডিত জনে ॥

এবার বাবুরাও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া উঠিলেন। আসরের লোকেরা হরিধ্বনি দিয়া উঠিল।

নিতাই বিজয়গর্বে ঢুলিটাকে বলিল—বাজাও।

এতক্ষণে সকলে নড়িয়া চড়িয়া বসিল, রাজা একবার ফিরিয়া স্ত্রী ও ঠাকুরঝির দিকে চাহিয়া হাসিল—অর্থাৎ, দেখ! স্ত্রী বিস্ময়ে মুগ্ধ হাসি হাসিয়া বলিল—তা বটে বাপু।